পবিত্র মাহে রমযান উপলক্ষে
মুসলিম ভাই—বোনদের প্রতি

বিশেষ আবেদন

অধ্যাপক গোলাম আযম

প্রচারেঃ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ
রবিউস সানি- ১৪১০
পৌষ- ১৩৯৭
জানুয়ারী- ১৯৯০

পরিবেশনায় ঃ
প্রচার বিভাগ
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
৫০৫ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৪০১৫৮১

মূল্য ঃ এক টাকা মাত্র

কম্পিউটারে শব্দ সংযোজনায় ঃ
কম্পিউটার হোম এন্ড প্রিন্টার্স
৪৪৫/১, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

কালেমা-নামায-রোযা-হজ্জ-যাকাত

ইসলামের এ পাঁচটি বুনিয়াদ
আল্লাহর দাসত্ব ও রাসূলের আনুগত্য
করার যোগ্য বানায়
এবং
দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের মুক্তির
পথে এগিয়ে দেয়

পুস্তিকাটি

এ কথারই সহজ—সরল ব্যাখ্যা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা এবং আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনে বেহেশতের সুখ লাভ করার জন্য যে সহজ-সরল জীবন বিধান পাঠিয়েছেন, তারই নাম দ্বীন ইসলাম। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) নিজে আমল করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন যে, আল্লাহর বিধান মেনে চললে সবচেয়ে মন্দ একটা সমাজও কিভাবে ভাল সমাজে পরিণত হয়। সেকালের সবচেয়ে অসভ্য আরব জাতি দ্বীন ইসলামের অনুসরণের ফলে চিরকালের জন্য মানব জাতির নিকট সভ্যতার আদর্শ কায়েম করতে সক্ষম হয়।

আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) আখিরাতের লক্ষ্যকে সামনে রেখে এ দুনিয়ার জীবনকে সুন্দর ও শান্তিময় করার উপায়ই শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষ হিসাবে দুনিয়ায় যত দায়িত্ব আছে, তা কিভাবে পালন করা উচিত এবং দুনিয়ার বস্তুগত যেসব মজা ভোগ করার জন্য দেয়া হয়েছে, তা কী নিয়মে ও কতটুকু ভোগ করা যায়, তিনি সে বিষয়েও বিস্তারিত শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) মানুষকে দুনিয়া ত্যাগ করে বৈরাগী হতে বলেননি বরং দুনিয়াদারী করারই সঠিক নিয়ম শিক্ষা দান করেছেন। দ্বীন ইসলামে মানুষকে যা কিছু করতে হুকুম করা হয়েছে, তা এ দুনিয়াতেই পালন করতে হয়। আখিরাতে পালন করার জন্য কোন হুকুম দেয়া হয়নি। আখিরাতে দুনিয়ার কাজের ফলটুকু শুধু পাবে। সেখানে কোন কাজ করা লাগবে না। দুনিয়ায় যে রকম কাজ করা হয়, সে রকম ফলই পরকালে পাওয়া যাবে। অর্থাৎ ইসলাম এ দুনিয়ার জীবনের জন্যই এসেছে। ধর্মের নামে দুনিয়ার দায়িত্ব থেকে পালাবার কোন পথ আল্লাহ ও রাসূল দেখাননি।

ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর কায়েম আছে- কালেমা, নামায, যাকাত, রোযা ও হজ্জ।" ইসলামকে যদি দালানের সাথে তুলনা করা যায়, তাহলে এ হাদীসটির অর্থ পরিষ্কার বুঝা যায়। দালান তৈয়ার করতে হলে প্রথমেই মযবুত ভিত্ বা বুনিয়াদ গাঁথতে হয়। এ ভিতের উপরই দালানের দেয়াল ও ছাদ তৈরী হয়। শুধু ভিত্ গাড়া হলেই তাকে দালান বলা যায় না এবং যে কাজের জন্য দালান দরকার, তা শুধু ভিতের দ্বারা পুরা হতে পারে না।

ঠিক তেমনি ইসলাম হলো মানব জীবনের সব দিক ও বিভাগ মিলে এক বিরাট দালান। এ দালানের ভিত্ হলো ঐ পাঁচটি। এ ভিত্ ছাড়া ইসলামের দালান হতেই পারে না। আবার শুধু ভিত্‌টুকু হলেই দালান হয়ে যায় না। আমাদের সমাজে ইসলামের দালান তো নেই-ই, এর পাঁচটি ভিত্‌ও মযবুত নয়।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ـ البقرة : ١٨٣

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি রোযা ফরয করা হইয়াছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর ফরয করা হইয়াছিল। সম্ভবত তোমরা পরহেযগার হইবে।—আল-বাকারা : ১৮৩

ইফতারের সংক্ষিপ্ত দোয়া

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ ٥

ইফতারের পূর্ণ দোয়া

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ ٥

কালেমা তাইয়েবার সঠিক অর্থ না বুঝলে ঈমান কী করে পয়দা হবে? কুরআন ও হাদীসে নামায, রোযা দ্বারা যে রকম চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে, তা কয়জনের মধ্যে পাওয়া যায়? যাকাত ও হজ্জের বেলায়ও একই কথা। তাই মুসলমান হিসাবে আমাদের সবাইকে এসব বিষয়ে জানতে ও বুঝতে হবে।

এ ছোট্ট পুস্তিকায় পবিত্র মাহে রমযান উপলক্ষে অতি সংক্ষেপে রোযা ও যাকাত সম্বন্ধে কয়েকটি জরুরী কথা পেশ করা হচ্ছে।

কালেমার সার কথা

ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির মধ্যে কালেমা তাইয়েবাই প্রথম ও প্রধান। এ কালেমা কবুল করেই আল্লাহর কাছে মুসলিম হিসাবে গণ্য হওয়া যায়। কালেমা কবুল করার মানে হলো এর অর্থ বুঝে মনে-প্রাণে সে কথা মানা। যে ব্যক্তি কালেমা তাইয়েবা কবুল করে, সে আসলে তার গোটা জীবনের জন্য বিরাট এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সে ফায়সালা করে যে, সব বিষয়ে- চিন্তা ও চেষ্টায় এবং কথা ও কাজে সে একমাত্র আল্লাহ্‌র মরযী মতোই চলবে এবং রাসূল (সাঃ) যেভাবে আল্লাহর কথা মতো চলা শিক্ষা দিয়েছেন, সেভাবেই চলবে। এর বিপরীত কারো মত ও পথেই চলবে না। একমাত্র আল্লাহর গোলাম হওয়াই কালেমার দাবী।

কালেমা মানে কথা। অর্থবোধক শব্দকেই কথা বলে। কালেমার অর্থ না বুঝলে কালেমার শব্দগুলো উচ্চারণ করলেই ঈমানের দাবী পূরণ হতে পারে না। একটি সহজ উদাহরণ দিয়ে এ কথাটা বুঝা যায়। যেমন আগুন একটি শব্দ। এ শব্দটির মধ্যে আগুন নেই। আগুন দ্বারা গরম যে জিনিসটা বুঝায়, তারই নাম আগুন। আগুন শব্দের অর্থটাই আগুন- শব্দটা আগুন নয়। ঠিক তেমনি কালেমা তাইয়েবার শব্দগুলো কালেমা নয়।

কালেমার অর্থের দিক বিবেচনা করলে একথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কালেমা কবুল করা মানে আল্লাহর নিকট দুটো বিষয়ে ওয়াদা করাঃ

(১) আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে হুকুমকর্তা (ইলাহ্) মানব না এবং আল্লাহর হুকুমের বিরোধী কোন হুকুম পালন করব না।

(২) আল্লাহর হুকুম পালন করার সময় একমাত্র রাসূল (সাঃ)-এর শেখানো তরীকা অনুযায়ী পালন করব এবং রাসূল ছাড়া আর কারো কাছ থেকে অন্য তরীকা গ্রহণ করব না।

নামায,রোযা, হজ্জ ও যাকাত

যে ব্যক্তি কালেমা কবুল করল, সে আসলে আল্লাহ্‌র সাথে দুটো বিরাট ওয়াদা করল। যে আল্লাহ হায়াত ও মওতের মালিক এবং দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তি যাঁর হাতে, সে মহান আল্লাহ্‌র সাথে ওয়াদা করা ছেলেখেলার ব্যাপার নয়। এ ওয়াদা পালন করে চলা অত্যন্ত কঠিন। যারা চেষ্টা করেন মেহেরবান আল্লাহ দয়া করে এ কঠিন কাজ তাদের জন্য সহজ করে দেন।

যারা সত্যিই এ ওয়াদা পালন করতে চায়, তাদের সবাইকে নিয়মিত রোজ পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামায়াতের সাথে আদায় করতে এবং রমযান মাসের রোযা রাখতে হয়। কারণ নামায ও রোযার দ্বারা ঐসব যোগ্যতা ও গুণাবলী পয়দা হয়, যার ফলে কালেমার ওয়াদা পালন করা সহজ হয়। আর যাদেরকে আল্লাহ পাক টাকা-পয়সা বেশী দিয়েছেন, তাদের জন্য নামায, রোযা যথেষ্ট নয়। টাকা-পয়সা বেশী হলে পাপ করার ক্ষমতা ও সুযোগ বেড়ে যায়। তাই তাদের জন্য যাকাত ও হজ্জের মাধ্যমে আরও কতক গুণ হাসিল করা জরুরী।

নামায,রোযা, হজ্জ ও যাকাতকে সবাই ইবাদত মনে করে। রুযী-রোযগার করা, সন্তান লালন-পালন করা এবং দুনিয়ার অন্যান্য দায়িত্ব পালন করাকে সাধারণত ইবাদত মনে করা হয় না। আসলে ইবাদত মানে মনিবের দাসত্ব করা বা তাঁর হুকুম পালন করে চলা। আবদ্ মানে দাস। এ থেকেই ইবাদত শব্দ হয়েছে। মানুষ হিসাবে দুনিয়ায় যত কাজ করতে হয়, তা যদি আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা অনুযায়ী করা হয়, তাহলে সব কাজই ইবাদতে পরিণত হয়।

দুনিয়ার সব কাজ আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা অনুযায়ী করার মন-মানসিকতা ও অভ্যাস গড়ে তুলবার জন্যই নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত ফরয করা হয়েছে। এ কারণেই এ চারটি কাজকে "বুনিয়াদী ইবাদত" বলে মনে করতে হবে। কারণ এ চারটি ইবাদত দুনিয়ার সব কাজকে ইবাদত বানাতে সাহায্য করে।

রোযা ও যাকাতের সম্পর্ক

রোযার সাথে যাকাতের সম্পর্ক অতি গভীর। রমযান মাসে যে কোন নেক কাজ অন্য সময়ের চেয়ে ৭০ গুণ বেশী মূল্যবান বলে এ মাসে প্রায় সবাই যাকাত আদায় করে। রাসূল (সাঃ) বলেছেন যে, রমযানে একটি নফল কাজ অন্য সময়ের ফরযের সমান এবং একটি ফরয কাজ অন্য সময়ের ৭০টি ফরযের সমান। তাই রমযানের এ বরকত হাসিলের আশায়ই এ মাসে প্রায় সবাই যাকাত দিয়ে থাকে।

রমযানের মর্মকথা

কুরআন মজীদে রোযার মাসের নাম রাখা হয়েছে রামাদান। রামদ(رمض) শব্দের অর্থ হলো পুড়িয়ে দেয়া। রামাদান মানে যা জ্বালিয়ে দেয়। রামাদানকে সাধারণভাবে এদেশে রমযান বলে। রমযানের রোযা গুণাহকে পুড়িয়ে দেয় এবং নাফসের খাহেশকে জ্বালিয়ে দিয়ে আল্লাহর খাটি বান্দা বানায়। এটাই এ নামের সার্থকতা। মাহে রমযান আল্লাহর গোলামীরই ট্রেনিং।

কুরআন ও হাদীসে রোযাকে সাওম বলা হয়েছে। রোযা ফারসী শব্দ এবং এর অর্থ হলো উপবাস। আরবীতে 'সাওম' শব্দের অর্থ হলো বিরত রাখা, বারণ করা বা ফিরিয়ে রাখা। রোযা মানুষকে পানাহার ও যৌনাচার থেকে বিরত রাখে, নাফসকে বারণ করে এবং শয়তানকে বান্দার কাছ থেকে ফিরিয়ে রাখে বলেই এর নাম হয়েছে 'সাওম।' তাই হাদীসে 'সাওম'কে 'ঢাল'ও বলা হয়েছে। শত্রুর আক্রমণ থেকে ঢাল যেভাবে রক্ষা করে, রোযাও তেমনি নাফসের তাড়না ও শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচায়। রোযা তাদেরকেই বাঁচায়, যারা এ উদ্দেশ্য বুঝে রোযা রাখে।

রোযার উদ্দেশ্য

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

(সূরা বাকারা, ১৮৩ আয়াত)

আল্লাহ-পাক বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা রাখার নির্দেশ দেয়া হলো, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের দেয়া হয়েছিল- যাতে তোমরা তাকওয়ার পথে চলতে পার।" যারা তাকওয়ার পথে চলে, তাদেরকেই মুত্তাকী বলা হয়। মন যা চায় তা না করে, যা ভাল তা করা এবং যা খারাপ তা থেকে বেঁচে থাকাকেই তাকওয়া বলে। তাকওয়া মানে বেছে বেছে চলা। আল্লাহ-পাক ও রাসূল (সাঃ) যা পছন্দ করেন, তা করা এবং যা অপছন্দ করেন, তা থেকে নিজকে বাঁচাবার চেষ্টাকেই তাকওয়া বলে। আর যে এ চেষ্টা করে, তাকে মুত্তাকী বা পরহেযগার বলা হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, সে-ই এ নিয়মে চলতে পারে। তাই খোদাভীরু লোককে মুত্তাকী বলা হয়।

সত্যিই রোযা তাকওয়ার গুণ সৃষ্টি করে, যে রোযা রাখে সে কখনও গোপনে চুরি করে খায় না। কঠিন পিপাসা লাগলেও রোযাদার লুকিয়ে পানি খেয়ে ফেলে না। লোক দেখানো কাজ অনেকই আছে, কিন্তু অন্যকে দেখাবার জন্য রোযা রাখা যায় না। কে সত্যিই রোযা রেখেছে, তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সঠিকভাবে জানতে পারে না। তাই রোযার পুরস্কার আল্লাহ নিজে দেবেন। এবার চৈত্র-বৈশাখ মাসে রোযা এসেছে। এ সময় পৌষ-মাঘের চেয়ে লম্বা দিন। তার উপর আবার গরম। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় যত কষ্টই হোক রোযাদার তা সহ্য করে। ঘরে খাবার আছে, পকেটে পয়সা আছে, যা ইচ্ছা খেতে বাধা দেবার কে আছে? তবু কেন রোযাদার লুকিয়ে খায় না? আল্লাহর ভয় ছাড়া আর কি কোন বাধা আছে? তাহলে প্রমাণ হলো যে, রোযা আল্লাহকে ভয় করে চলতে অভ্যাস করায়।

রোযার এ মহান উদ্দেশ্য যারা জানে, তারা রেওয়াজ হিসাবে রোযা রাখে না। তারা সচেতনভাবেই রোযা রাখে। তারা একমাত্র আল্লাহর খাতিরেই রোযা রাখে। আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য ও আল্লাহকে খুশী করার জন্যই তারা ইচ্ছা করে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার কষ্ট ভোগ করে। যারা আল্লাহর খাতিরে রোযায় এত কষ্ট করে, তারা আর সব ব্যাপারেও আল্লাহর হুকুম পালন করার যোগ্যতা লাভ করে। এভাবেই রোযা তাকওয়ার গুণ পয়দা করে।

রোযার শিক্ষা ও উপকারিতা

তাকওয়ার যোগ্য হওয়াই রোযার আসল উদ্দেশ্য। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করাই তাকওয়ার মূল লক্ষ্য। রোযার এ মহান উদ্দেশ্য ছাড়াও রোযার মাধ্যমে অনেক মূল্যবান শিক্ষা লাভ করা যায় এবং বহু সামাজিক উপকারিতা হাসিল করা যায়। আল্লাহর প্রতিটি হুকুমের মধ্যেই মানুষের জন্য অগণিত কল্যাণ ও বরকত রয়েছে। রোযার মাত্র কয়েকটি বড় বড় শিক্ষা ও উপকারিতা এখানে বর্ণনা করা হচ্ছেঃ

(১) রোযা রাখার ফলে ধনীরা গরীবের দুঃখ বুঝবার যোগ্য হয়। ক্ষুধার যে কী জ্বালা, তা রোযা ছাড়া ধনীদের পক্ষে বুঝার কোন উপায়ই নেই। এভাবেই রোযা ধনীদের মনে গরীবের জন্য দরদ ও মমতাবোধ সৃষ্টি করে।

(২) স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও রোযা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী বলে চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে।

(৩) রমযানে দিনে রোযা রাখা, রাতে তারাবীহ নামায আদায় করা, শেষ রাতে সেহরীর জন্য ওঠা এবং এসবের সাথে দৈনন্দিন যাবতীয় দায়িত্ব পালন করা

রীতিমতো কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ১৪/১৫ ঘন্টা ক্ষুধা ও পিপাসার পর ইফতারের সাথে সাথে শরীর চরম অবসাদে বিছানায় এলিয়ে পড়ে। কিন্তু তারাবীহ নামাযের কারণে বিশ্রাম নেবারও সময় পাওয়া যায় না। শেষ রাতে খাবার পর ফজরের জামায়াতের আগে শোয়ারও উপায় নেই। রোযা সত্যিই কঠিন ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা করে।

এভাবে একটানা পূর্ণ এক মাস যে সিয়াম সাধনা করা হয়, তাতে আরামপ্রিয় শরীরও বাধ্য হয়ে পরিশ্রমী হয়ে ওঠে এবং বিলাসিতা ত্যাগ করে।

(৪) এক মাসে পুরা কুরআন একবার পড়ার সৌভাগ্য কম লোকেরই হয়। তারাবীহ-তে হাফিয সাহেবদের মুখে অল্প সময়ের মধ্যে গোটা কুরআন শুনে যে মানসিক তৃপ্তি পাওয়া যায় এর কোন তুলনা নেই।

(৫) রমযান হলো মুমিনের জন্য সাওয়াব কামাবার খাস মাস। এ সময় একটি ফরয অন্য সময়ের ৭০টির সমান, আর নফলও ফরযের সমান। নেক কাজের এক বিরাট মওসুম। এক পয়সা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খরচ করলে ৭০ পয়সা খরচ করার সওয়াব পাওয়া যায়। একজন ভুখা লোককে খাওয়ালে ৭০ জনকে খাওয়াবার সওয়াব হয়। তাই রমযানে রোযাদারদের বিরাট সুযোগ। যত বেশী নেক কাজ করা যায় ততই লাভ। এ কারণেই রমযানে প্রায় সবাই যাকাত দেবার চেষ্টা করে। এভাবেই রোযার সাথে যাকাতের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়েছে।

(৬) ঈদের দু'একদিন আগে ফিত্‌রা দান করে মুসলিম সমাজের গরীবদেরকেও ঈদের খুশীতে শরীক করা হয়। হাদীসে 'ফিতরা'কে 'গরীবের খাবার' বলা হয়েছে। ফিত্‌রা না দেয়া পর্যন্ত রোযা কবুল হয় না। রোযায় যেসব দোষ-ত্রুটি থেকে যায় ফিত্‌রা দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ হয়ে যায় বলে হাদীসে ফিত্‌রাকে 'যাকাতুস্ সাওম' বা 'রোযার পবিত্রকারী' নাম দেয়া হয়েছে।

যাকাতের সার কথা

যাকাত শব্দের অর্থ হলো পাক হওয়া, উন্নত হওয়া, বিকাশ লাভ করা ও বৃদ্ধি পাওয়া। ইসলামী পরিভাষায় যাকাত মানে ঐ মাল, যা সচ্ছল মুসলমান ইবাদত মনে করে কুরআনের হুকুম মুতাবিক নির্দিষ্ট হারে দান করে।

যাকাত আদায় করলে দাতার বাকী সব মাল পাক হয়। আল্লাহ যাকাতদাতার মালে বরকত দিয়ে বাড়িয়ে দেন এবং আখিরাতের উন্নত জীবন দান করেন। আল্লাহ মানুষকে যত নিয়ামত দান করেছেন, সে সবেরই শুকরিয়া আদায় করা উচিত। নামায ও রোযা দ্বারা স্বাস্থের শুকরিয়া আদায় হয়। কোরবানী দ্বারা পশু-সম্পদের শুকরিয়া, উশর দ্বারা ফসলের শুকরিয়া এবং যাকাত দ্বারা আল্লাহর দেয়া

ধন-সম্পদের শুকরিয়া আদায় করা হয়। যে যাকাত দেয়, সে আসলে এ কথা বিশ্বাস করে যে, "তার কাছে যত টাকা-পয়সা ও মাল-সামান আছে, তা আল্লাহরই মেহেরবানী এবং এর আসল মালিক আল্লাহ। তাই আল্লাহর কথা মতোই সে মাল আমাকে ব্যবহার করতে হবে। শুধু যাকাত দিলেই চলবে না। সমস্ত মালই আল্লাহর পছন্দমত খরচ করতে হবে। হারাম পথে খরচ করা যাবে না।"

যাকাত যেসব খাতে খরচ করার জন্য কুরআন-পাকে হুকুম দেয়া হয়েছে, তাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সমাজের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানই এর প্রধান উদ্দেশ্য। তাই যে কোন কারণে কেউ মৌলিক প্রয়োজন পূরণে অক্ষম হলে তার যাকাত পাওয়ার হক আছে। যার যাকাত দেবার ক্ষমতা নেই, সে যাকাত নিতে পারে।

যাকাত কোন্ কোন্ খাতে দিতে হবে?

যাকাত ইচ্ছামত যে কোন খাতেই খরচ করা যায় না। আল্লাহ-পাক নিজে কুরআন মজীদে এর জন্য ৮টি খাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সূরা তাওবার ৬০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

এ সাদকা শুধু তাদের জন্য-যারা ফকীর, মিসকীন ও যাকাত সংক্রান্ত কাজে যারা নিয়োজিত, যাদের মনকে (ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে) অনুগত করা দরকার তাদের জন্য, বন্দী বা দাসদের মুক্তির জন্য এবং আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরয করা হয়েছে। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহাকুশলী।

১। এ আটটি খাতের মধ্যে ফকীরের কথা প্রথম উল্লেখ করা হয়েছে। অসহায় বিধবা, ইয়াতীম, পঙ্গু ইত্যাদি যাদের রোযগারের উপায় নেই বলে অপরের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল, তারাই ফকীর।

২। মিসকীন ঐসব ভদ্রলোকদেরকে বলা হয়, যাদের প্রয়োজন পূরণ হবার মতো ব্যবস্থা নেই- অথচ তারা কারো কাছে চায় না। তারা আয় করার চেষ্টা করে

কিন্তু তাতেও মৌলিক প্রয়োজন পূরণ হয় না। রাসূল (সাঃ) তাদের পরিচয় দিয়েছেন যে, তারা অভাবী হলেও কারো কাছে হাত পাতে না। এ দু'রকমের লোক যদি নিকট-আত্মীয় হয়, তাহলে তাদের হক পয়লা। দূরের আত্মীয় এর পর এবং অন্য লোক তাদেরও পর যাকাতের হকদার।

৩। তৃতীয় খাত এখন নেই বললেই চলে। ইসলামী সরকার যাকাত বিভাগের মাধ্যমে যাকাত আদায় করে এবং হকদারদের কাছে তা পৌছাবার ব্যবস্থা করে। এ বিভাগের কর্মচারীদের বেতন যাকাতের তহবিল থেকে দেয়া জায়েয। ইসলামী রাষ্ট্র এ দেশে নেই বলে এ খাতও নেই। যে সরকার নামায কায়েমের ব্যবস্থা করে না, সে সরকারের হাতে জনগণ যাকাত তুলে দিতে রাযী হয় না। কারণ তাদের হাতে যাকাত ঠিকমত ব্যবহার হবে বলে বিশ্বাস করা যায় না।

৪। চতুর্থ খাত হলো ইসলামী রাষ্টের প্রতি অমুসলিমদের মনকে অনুগত করা এবং নওমুসলিমদেরকে পুর্নবাসন করার জন্য।

৫। ৫ম খাত হলো ক্রীতদাস বা বন্দীদেরকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে।

৬। ৬ষ্ঠ খাত হলো ঋণগ্রস্ত লোককে ধার শোধ করতে সাহায্য করা।

৭। ৭ম খাত হলো ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহ্‌র পথে দান করা।

৮। ৮ম খাত হলো মুসাফিরকে সাহায্য করা।

এ আটটি খাতে যাকাতের টাকা খরচ করার জন্য কুরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ আটটি উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কাজে যাকাত দেয়া ঠিক নয়।

কোন্ কোন্ খাত বেশী গুরুত্বপূর্ণ

আমাদের দেশের পরিবেশে যাকাতের টাকা খরচ করার ব্যাপারে ৩টি খাতই সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ-১ম, ২য় ও ৭ম। আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যারা ফকীর ও মিসকীন, তাদের হক সবচেয়ে প্রথম। আত্মীয়দেরকে পরের দুয়ারে হাত পাতার অপমান থেকে বাঁচাবার গুরুত্ব অনেক। গরীব আত্মীয়দের খবর জানা আত্মীয়ের পক্ষেই সহজ এবং তাদের অভাব দূর করা আত্মীয়দেরই দায়িত্ব।

আত্মীয়-স্বজনের বাইরে এ দেশের গরীবের হিসাব করাই অসম্ভব। বিশেষ করে যারা ঘরে ঘরে যেয়ে হাত পাতে এবং ভিক্ষাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছে, তাদেরকে বর্তমান পদ্ধতিতে যাকাত দিয়ে সমস্যার কোন সমাধান হবে না। এদের সমস্যা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সমাধান করা ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে যাকাত দিলে ভিক্ষার অভ্যাস আরো বেড়েই যাবে। এতে যাকাতের উদ্দেশ্য সফল হবে না।

৬ষ্ঠ ও ৮ম খাতও সরকারী উদ্যোগের বিষয়। অবশ্য ঋণগ্রস্ত আত্মীয় হলে এর গুরুত্ব দিতে হবে এবং কোন মুসাফির বাড়ীতে সচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও কোন কারণে সফরে এসে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েছে বলে জানা গেলে তাকেও দিতে হবে। কিন্তু ভিক্ষার জন্য মুসাফির বেশ ধারণ করলে সে এ খাতের মধ্যে গণ্য নয়। যে যাকাত পাওয়ার যোগ্য নয়, তাকে দিলে যাকাত আদায় হয় না।

১ম ও ২য় খাতের পর এদেশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাতই হলো ৭ম খাত-আল্লাহর পথে দান।

৭ম খাতের পরিচিতি

কুরআনের ভাষায় এ খাতটির নাম হয়েছে ফী সাবীলিল্লাহ। এর অর্থ হলো আল্লাহর পথে। যে কোন ভালো কাজে খরচ করাকেই যদি আল্লাহর পথে খরচ মনে করা হয়, তাহলে এতগুলো ভাল কাজে খরচের উল্লেখ করে "আল্লাহর পথে" নাম দিয়ে আলাদাভাবে একটা খাতের কথা কেন বলা হলো?

এ কারণেই তাফসীরকারগণ "ফী সাবীলিল্লাহ"-কে "জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ" অর্থ করেছেন। জিহাদ ঐসব চেষ্টা-সাধনাকেই বলা হয় যার উদ্দেশ্য হলো বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে দ্বীনে হককে বিজয়ী করা। অর্থাৎ ইসলামী আন্দোলনই হলো ৭ম খাত। ইকামাতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে যেসব কাজ করা হয়, তা এ খাতের মধ্যে শামিল।

অনেকেই জিহাদ মানে যুদ্ধ মনে করে। জুহ্‌দ্ মানে চেষ্টা। জিহাদ মানে বিরোধী শক্তির সাথে মুকাবিলা করার চেষ্টা করতে থাকা। আর 'আল্লাহর পথে জিহাদ' মানে বাতিল শক্তির বাধার পরওয়া না করে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। "ইসলামী আন্দোলন" পরিভাষাটি "জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর" সার্থক অনুবাদ। দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করা ও বিজয়ী রাখার জন্য যদি যুদ্ধ করতে হয়, তাহলে তা-ও জিহাদ হিসাবে গণ্য। যুদ্ধের জন্য কুরআনে 'কিতাল' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিতাল মানে একে অপরকে কতল করা।

ইকামতে দ্বীনের কাজ বা ইসলামী আন্দোলনই রাসূল (সাঃ)-এর প্রধান দায়িত্ব ছিল। রাসূল (সাঃ)-এর উপর যারা ঈমান এনেছিলেন তাঁরাও ঐ দায়িত্ব পালনে রাসূল (সাঃ)-এর সাথী ছিলেন। সুতরাং মুসলিম হিসাবে আমাদেরও প্রধান দায়িত্ব হলো ইসলামকে কায়েম করা। এ কাজে যাকাত ব্যয় করার জন্য আল্লাহই নির্দেশ দিয়েছেন। এ দেশে ইসলাম কায়েম নেই বলে এর গুরুত্ব আরও বেশী। তাই এ খাতে যাকাত দেবার গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অনেক বেশী।

আমাদের দেশে মাদ্রাসা, ইয়াতীমখানা ও গরীব-মিসকীনদেরকে যাকাত দেবার রেওয়াজ অতীতকাল থেকে চলে এসেছে। তাই এ সব কাজে যাকাত দিতে কেউ আপত্তি করে না। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনে যাকাত দিলে ঠিক হবে কিনা সে বিষয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন করে। এর কারণ এই যে, সমাজে এ খাতটি পরিচিত ছিল না। ইসলামী আন্দোলনের পরিচয় যতই বাড়ছে, ততই এ খাত সম্বন্ধেও সবার ধারণা স্পষ্ট হচ্ছে।

যাকাত আদায়ের নিয়ম

পাঁচ ওয়াক্ত জামায়াতে নামায আদায় করা ফরয। মুসলিম জীবনের জন্য জামায়াতবদ্ধ জীবন যাপনের উপর রাসূল (সাঃ) অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। সফরে থাকা অবস্থায়ও আমীর নির্বাচিত করে জামায়াতবদ্ধভাবে চলবার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। রোযা ও হজ্জ একই সময় সবাইকে একই সাথে আদায় করার হুকুম করা হয়েছে। যাকাতের বেলায়ও ইসলাম জামায়াতবদ্ধ পদ্ধতি দান করেছে।

নামায কায়েম করা, রোযার হিফাযত করা এবং হজ্জের ব্যবস্থা করা যেমন ইসলামী সরকারের দায়িত্ব, তেমনি সরকারী ব্যবস্থায় যাকাতদাতাদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করা এবং হকদারদের হাতে তা পৌঁছিয়ে দেয়াই ইসলামের বিধান। বর্তমানে আমাদের দেশে ইসলামী সরকার নেই বলে মানুষ বাধ্য হয়ে ব্যক্তিগতভাবেই যাকাত দিয়ে থাকে। কিন্তু এটা সঠিক নিয়ম নয়। যাকাতের বহু হকদার লোক ধনীদের কাছে হাত পাতে না। যারা হাত পাতে, তারা ধনীর দয়া মনে করেই যাকাত পেয়ে থাকে। অথচ যাকাত পাওয়া গরীবের পাওনা বা হক এবং দেয়া হলো ধনীর কর্তব্য ও দায়িত্ব। যাকাত ধনীদের দয়া ও গরীবের ভিক্ষা নয়।

যাকাতের এ মর্যাদা বহাল রাখা এবং হকদারদের আত্মসম্মান বজায় রাখার প্রয়োজনে মুসলিম সমাজে জামায়াতবদ্ধভাবে যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণের ব্যবস্থা থাকা উচিত। ইসলামী সরকার না থাকা সত্ত্বেও যেমন নামাযী মুসলমানরা মসজিদ ও জামায়াতে নামাযের ব্যবস্থা করে থাকে, তেমনি যাকাতের বেলায়ও ব্যবস্থা করা উচিত। তাই জামায়াতে ইসলামীর সাথে সম্পর্কিত সবাইকে জামায়াত জামায়াতবদ্ধভাবে যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণের সুযোগ করে দিয়েছে।

যারা ইসলামের সঠিক নিয়মে যাকাত আদায় করতে চান, তারা জামায়াতের মাধ্যমে তাদের যাকাত আদায় করতে পারেন। বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলনে

বা আল্লাহর পথে যারা যাকাতের কোন অংশ দান করতে আগ্রহী, তারা জামায়াতের মাধ্যমে এ মহান কাজে শরীক হবার মহা সুযোগ নিতে পারেন।

মুসলিম ভাই—বোনদের প্রতি বিশেষ আবেদন

পবিত্র রমযানে যাতে প্রতিটি মুসলিম রোযা রাখে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা ইসলামী সরকারের দায়িত্ব। ইসলামী আইন অনুযায়ী কোন সক্ষম মুসলিম রোযা না রাখলে ফৌজদারীতে সোপর্দ হবে। কিন্তু এ দেশে ইসলামী সরকার নেই বলে মুসলিম সমাজের উপরই এ বিষয়ে কতক দায়িত্ব বর্তায়। বেসরকারী প্রচেষ্টায় ইসলামী আইন অন্যের উপর প্রয়োগ করা যায় না। কিন্তু আল্লাহর কোন বিধান অমান্য হতে দেখলে মানুষকে তা থেকে ফিরাবার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করা মুসলিমদের ঈমানী দায়িত্ব বলে রাসূল (সাঃ) ঘোষণা করেছেন।

তাই সকল সচেতন মুসলিমগণের প্রতি জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে গ্রাম, মহল্লা ও মসজিদ ভিত্তিতে নিম্নরূপ ৫-দফা কাজ করার আবেদন জানান হচ্ছেঃ

(১) এলাকাবাসীকে রমযানের রোযা রাখার জন্য আকুল আবেদন জানান, তাদেরকে রোযার রহমত ও বরকত সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান দেবার ব্যবস্থা করুন। রোযাদারদেরকে উদ্বুদ্ধ করুন যাতে তারাবীহের নামায জামায়াতে আদায় করেন এবং মন্দ কাজ, মিথ্যা কথা ও ঝগড়া-ফাসাদ করে যেন রোযা নষ্ট না করেন।

(২) নিজ নিজ এলাকায় হোটেল, রেস্টুরেন্ট ও খাবার দোকান ফজর থেকে আসর পর্যন্ত বন্ধ রাখার জন্য অনুরোধ করুন।

(৩) প্রত্যেক মসজিদে যেন খতম তারাবীহ-এর ব্যবস্থা হয়, সে জন্য চেষ্টা করুন, কারণ রমযান মাসেই কুরআন নাযিল হয়েছে। প্রতিদিন কুরআনের ঐটুকু অংশ তিলাওয়াত করুন যেটুকু পরবর্তী তারাবীহতে শুনবেন। তাহলে শুনে মজা পাওয়া যাবে। তারাবীহ-এর পর বা অন্য কোন সময় রোযার মাসআলা-মাসায়েল, রোযার ফযীলত ও হাকীকত সম্পর্কে আলোচনা ও চর্চা করুন।

(৪) ঈদের আগেই ফিতরা আদায় করে এলাকার গরীব-মিসকীনদেরকে ঈদের খুশীতে পূর্ণরূপে শরীক করার ব্যবস্থা করুন। এ বিষয়ে বিশেষ করে গরীব আত্মীয় ও প্রতিবেশীর প্রতি খেয়াল রাখুন।

(৫) যাদের উপর যাকাত ফরয করা হয়েছে, তারা যাতে যথা নিয়মে যাকাত আদায় করেন, সে বিষয়ে তাদেরকে তাকীদ দিন। আপনার যাকারেত একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ইকামতে দ্বীনের জন্য দান করুন।

যাকাতের সাওয়াব ছাড়াও এ খাতের জন্য দেয় টাকা দিয়ে যেসব কাজ করা হবে, তারও সাওয়াব পাবেন এবং যদ্দিন এসব কাজ চালু থাকবে তদ্দিন সাদকায়ে জারিয়ার সাওয়াব পেতেই থাকবেন। *

রোযা ভঙ্গের কারণসমূহ

- রোযা রেখে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করা।
- যে কোন পন্থায় যৌন সম্ভোগ এবং স্ত্রী-সহবাস করা।
- শরীরে এমন ওষুধ প্রবেশ করানো, যা পেটে প্রবেশ করে।

রোযা মাকরূহ হওয়ার কারণসমূহ

- অনর্থক কোন কিছু চিবানো।
- শরীয়তসম্মত কারণ ব্যতীত কোন কিছুর স্বাদ গ্রহণ করা।
- গরম ও পিপাসা হালকা করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে বেশী বেশী পানি ব্যবহারকরা।
- ওযুতে গড়গড়া করা।
- নাকের মধ্যে পানি টেনে লওয়া।
- টুথ পাউডার, পেষ্ট, কয়লা বা মাজন দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করা।
- গীবত, মিথ্যা, অশ্লীল কথা, ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদিতে লিপ্ত হওয়া।
- সারা দিন নাপাক অবস্থায় থাকা বা সোবহে সাদেকের পরে ফরয গোসল করা।
- আমানতের খেয়ানত করা ও গালাগালি করা।

---

* কালেমা, নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জের সঠিক মর্ম বুঝতে ও জানতে হলে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী প্রণীত ঈমানের হাকীকত, ইসলামের হাকীকত, নামায-রোযার হাকীকত, যাকাতের হাকীকত ও হজ্জের হাকীকত (একত্রে ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা) বইগুলি পড়ুন।